ক্ষুধা ও সাহিত্য

সুমিতা চক্রবর্তী

মানুষের উপলব্ধির ভাষিত রূপই সাহিত্য। সেই উপলব্ধি হৃদয়ের এবং শরীরের। মন ও শরীর সর্বদা পৃথক থাকে না। প্রেম, যন্ত্রণা,রোগ, তাপ শৈত্য এবং ক্ষুধা --- এ সবই মন ও শরীরকে অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বেঁধে রাখে। বেঁচে থাকবার শর্ত যে কয়েকটি পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে প্রধানতম হলশ্বাসগ্রহণের বায়ু আর প্রাণধারণের অন্ন - জল। ক্ষুধার খাদ্য যে কোনো প্রাণীর প্রাণধারণের ন্যূনতম উপাদান; আবার মানুষের সভ্যতায় এই আবশ্যিক উপাদানটিকে অবলম্বন করে কত না কারিগরি।

উপনিষদের একটি গল্প শুনেছিলাম সুকুমারী ভট্টাচার্যের কাছে। এক ঋষি দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের অভাবে বিপন্ন। কোথাও খাবার না পেয়ে যখন তিনি কাতর, তখন দেখলেন এক চণ্ডাল কিছু সিদ্ধ মুগ ভক্ষণ করছে। ব্রাহ্মণ ঋষি চণ্ডালের কাছে প্রার্থনা করলেন সেই মণ্ড। সন্ত্রস্ত চণ্ডাল যখন প্রশ্ন করে -- প্রভু কি তার উচ্ছিষ্ট খাদ্য খাবেন? তখন ব্রাহ্মণ উত্তর দেন -- তিনি খাবেন কারণ না খেলে তাঁর প্রাণ বাঁচবে না। অতএব চণ্ডালটি পুনশ্চ বিস্মিত - প্রভু যে এইমাত্র আমার উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেলেন! ব্রাহ্মণের উত্তর -- খেলাম, কারণওটা না খেলে আমার প্রাণ বাঁচত না । কিন্তু প্রাণের ভয় যখন আর নেই তখন আচার কেন রক্ষা করব না।?

উপনিষদ - প্রণেতা ঋষির নীতিবাক্যটি অতি স্বচ্ছ - ক্ষুধার সামনে শাস্ত্রবিধি অর্থহীন। উপনিষদের ঋষি কথাটি বলেছেন বলেই আমাদের কাছে অতি গুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় এই প্রাচীন গল্পটি। উপনিষদ যে কেন এক মহৎ সৃষ্টি তা আমরা বুঝতে পারি এখানে। যেমন আমাদের প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং শাস্ত্রবিধির বহুমুখী আধার উপনিষদ--- তেমনই উপনিষদ থেকেই জাগ্রত হয় সংস্কারবিহীন মুক্তবুদ্ধির চিন্তন। ছান্দোগ্য - উপনিষদের বহুশ্রুত উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতুর কাহিনিটিও মনে পড়ে। যেখানে পিতা পুত্রকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন -- অন্নই ব্রহ্ম।

উপনিষদ থেকে আমরা আরও ক্ষুধার গল্প পাই। একটি গল্পের কেন্দ্রে আছেন পুরাণের ত্রুদ্ধ ক্ষত্র - ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র। অনাবৃষ্টিরফলে শস্য উৎপাদিত হয় না। পৃথিবীতে ক্ষুধার হাহাকার। বিশ্বামিত্র চণ্ডালগৃহ থেকে ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করেছিলেন কুকুরমাংস। যখন তিনি সেই মাংসই খেতে যাচ্ছেন, তখন বিচলিত দেবতারা নামালেন বৃষ্টি। ধরণী - আবার শস্যপূর্ণ হল।

উপনিষদের এই দুটি গল্প থেকে একটি আশ্চর্য সূত্র বেরিয়ে আসে। ব্রাহ্মণ যখন ক্ষুধায় বিপন্ন, তখনও কিন্তু চণ্ডালের ঘরে আছে খাদ্য। ব্রাহ্মণ সেই খাদ্য কেড়ে নিয়ে বা চুরি করে বাঁচতে চায়। উপনিষদের ঋষি কি এ কথাই বলতে চান --- অর্থহীন সংস্কারে নিজেদের বাঁধেনি বলে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা বেশি? তা ছাড়াও এই দলিতবর্গের মানুষেরাশ্রমজীবী। বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যাজীবীদের মতো অন্যের শ্রমের উৎপাদনে তাঁরা বাঁচে না। তাই তাদের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা বেশি?তা ছাড়াও এই দলিতবর্গের মানুষেরা শ্রমজীবী। বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যাজীবীর মতো অন্যের শ্রমের উৎপাদনে তাঁরা বাঁচে না। তাই তাদের লড়াইটা অব্যাহত থাকে। একেবারে শেষ পর্যন্ত। গল্পগুলির অপরিসীম গুত্ব এখানেই যে, গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে উপনিষদে।

আর একটি পৌরাণিক গল্প। ব্রহ্মা যখন জীব সৃষ্টি করছিলেন তখন তিনি সৃষ্টি করলেন যক্ষ। সেই মুহূর্তে কোথাও কোনও

খাদ্য ছিল না। যক্ষরা খেতে উদ্যত হল জীবস্রষ্টা ব্রহ্মাকেই।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু ব্যাধের আখ্যানে, ফুল্লরার বারমাস্যায় দেখা যায় খাদ্যের অভাবের কথা বলে বার বার দেবীকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে ব্যাধপত্নী। কারণ দেবী বলেছেন---কালকেতুর ঘরেই তিনি থাকতে চান। বাড়িতে যথেষ্ট ভাত থাকে না। খেতে হয় ভিজানো ভাতের জল। গাছের পাতায় রেখে ভাত খাওয়া চলে কিন্তু ভাতের জলটি খাবার জন্য ঘরে পাত্র নেই দরিদ্র ব্যাধের। মাটিদাওয়ায় গর্ত করে খেতে হয় সেই তরল খাদ্য। ফুল্লরার দারিদ্র্যজ্ঞাপক সেই পঙ্‌ক্তিটি স্মরণীয় হয়ে আছে --- 'আমনি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।'

প্রসঙ্গত মনে পড়ে -- রবীন্দ্রনাথ এই পঙ্‌ক্তিটি পছন্দ করতে পারেননি। খাদ্য এবং ক্ষুধা প্রসঙ্গে এই অনাবৃত প্রকাশ তাঁর ক াছে কাব্যগুণোচিত মনে হয়নি। তিনি পরিহাস করে বলেছিলেন -- এ যদি কবিতা হয়, তাহলে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে' --এটিও কবিতা - পঙ্‌ক্তি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পরিহাসের সঙ্গে আমরা সহমত হতে পাই না। উক্ত পঙ্‌ক্তিটি কবিতার পঙ্‌ক্তি তো হতেই পারে। যে মানুষটি ওই কথা উচচারণ করেছে তার জল পান করবার মতো একটি মা টির ভাঁড়ও নেই। তাকে জলপান করতে হয় নদী বা পুকুরের ঘাটে, পাত্রবিহীন, গো, মহিষ, ছাগলের মতো। এই প্রসঙ্গে অ ারও মনে পড়ে -- সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে ক্ষুধার তীব্রতা এপ্রসঙ্গে আরও মনে পড়ে -- সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে ক্ষুধার তীব্রত া এবং সেই তীব্রতা জনিত প্রতিত্রিয়া দেখানো হয়েছে এমন অংশ পাওয়াই যায় না। একমাত্র 'শাস্তি' গল্পের কৃষিশ্রমিক দুখিরাম বাড়ি ফিরে ভাত না পেয়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে স্ত্রীকে এমন আঘাত করেছিল যে সে আর প্রাণে বাঁচেনি। এখ ানেও দেখা যায় -- দুখিরামের ত্রোধ কেবল ক্ষুধার কারণে নয়, স্ত্রীর কটুবাক্যের দ্বারাও ইন্ধন পেয়েছে। দ্বিতীয়ত স্ত্রীকে মেরে ফেলতে সে চায়নি। অতি নিম্নবিত্তের ঘরে স্ত্রীকে প্রহার করা কোনো নতুন ঘটনা নয়। তৃতীয়ত, এ-ও মনে রাখতে হবে যে, 'শাস্তি' গল্পটি নারী - পুষ সম্পর্কের জটিল গ্রন্থির গল্প , ক্ষুধাজনিত কোনও আখ্যান নয়। রবীন্দ্র - সাহিত্যে এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে একান্তভাবে তীব্র ক্ষুধার এবং খাদ্যহীনতার অনুভূতিকে রূপায়িত করবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্তদের দ্বারা লিখিত এবং পঠিত হত; মধ্যবিত্তের গণ্ডীর বাইরে বিস্তৃত ছিল না ত ার সঞ্চরণ।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মন্বন্তর বর্ণনকে বলা যেতে পারে একটি চমৎকার উদাহরণ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দে) বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসটিতে যেভাবে চিত্রিত হযেছে তার তুলনা হয় না প্রথমে তিনি দুর্ভিক্ষের কারণ বর্ণনা করেছেন ---"১৯৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১৯৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল -- লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ...আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে হইয়া গেল, যার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না, প্রথমে এক সন্ধ্যা উপব াস করিল,তারপর এক সন্ধ্যা আধপেট করিয়া কাইতে লাগিল। তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল খাইতে লাগিল। তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইন না কিছু মহম্মদ রেজা খাঁ আদায়ের কর্তা, মনে করিল , আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড় াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।"

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র এই দুর্ভিক্ষের ফলে যে খাদ্যাভাব এবং মাসিক প্রতিত্রিয়া সামাজিক প্রতিত্রিয়া দেখা দিল তার সংহত ও নিবিড় বর্ণনা করেছেন ---

"লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়! --- উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগ াত্রান্ত হইতে লাগিল। গো বেচিল, লাঙ্গল জোরালো বেচিল বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। ত ারপর মেয়ে, ছেলে স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে আরম্ভ করছিল। তারপর ছেলে স্ত্রী কে কিনে খরিদ্দার ন াই, সকলেই বেঁচতে আরম্ভ করিল। তারপরমেয়ে, ছেলে স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই , সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড় াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল। যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, ত

াহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।'

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র এসেছেন উপন্যাসের প্রথম পর্বে মহেন্দ্র এবং কল্যাণীয় গ্রাম ত্যাগের বর্ণনায়। পদচিহ্ গ্রাম ত্যাগ করে শহরের পথে চলেছেন তাঁরা। পথে জলশূন্য চটিতে স্ত্রী - কন্যাকে রেখে দুধ আনতে গেলেন মহেন্দ্র। ভাঙা চটিতে সেই ভয়ংকর সন্ধ্যায় এসে দাঁড়াল ছায়ার মতো একদল মানুষ।

"মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তুমনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেই রূপ আর একটা ছায়া - শুষ্ক কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ--- প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আর একটি আসিল। তারপর আরও একটি আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায় অন্ধকার গৃহ নিশীথশ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুযেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ প ার হইয়া এক জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র সর্বশেষে দেখিলেন -- খাদ্যের অভাবে কীভাবে মানুষ পশুবৎ অমানুষে রূপান্তরিত হয়। কল্যাণী ও তার শিশুকন্যাকেঅপহরণ করবার পর দাও, চাল দাও' চিৎকার দলপতিকে আক্রমণ করে। দলপতির মৃত্যু হল। তখন ক্ষুধার্ত দস্যুরা স্থির করল -- "শৃগাল - কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি --- ক্ষুধায় প্রাণ যায়। জ্বালানো হয়েছে তখন তাদের মনে হল -- - যদি মানুষের মাংসই খেতে হয় তবে ওই দুর্ভিক্ষ শীর্ণ ব্যক্তিটিকে কেন? কচি মেয়েকে পুড়িয়ে খেলেই তা অধিক সুস্বাদু হবে। যদিও কল্যাণী ও সুকুমারীকে তারা পেল না। তাদের কলহের সুযোগে কল্যাণী স্থান ত্যাগ করেছিল। ক্ষুধার্ত ম ানুষের প্রসঙ্গে এখানেই শেষ। বঙ্কিমচন্দ্র পরিচ্ছেদটির শেষে মন্তব্য করেছেন --- "অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।"

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ক্ষুধাপীড়িত মানুষের এই মর্মান্তিক রূপায়ণ আর পাওয়া যায় না। কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকের প্রসঙ্গে কিছুটা ক্ষুধার রূপ চিত্রিত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রে 'আনন্দমঠ' থেকে কিন্তু একটি সত্য ফুটে ওঠে। দুর্ভিক্ষের কালে দরিদ্রবর্গের মানুষ যেভাবে সম্পূর্ণ নিরন্ন এবং মৃতকল্প হয়ে পড়ে, ধনী বা উচচ মধ্যবিত্ত বা অন্য কোনও রকম সংগতিপন্ন ব্যক্তিরা বিপন্ন হলেও ততটা ক্ষুধাপীড়িত হয় ন া। সেই সঙ্গে এ -ও দেখা যায় গ্রামাঞ্চল যতটা খাদ্য - রিক্ত হয়ে পড়েছে, নগরাঞ্চলের মানুষ খানিকটা আর্থিক সম্পন্নত ার কারণে, খানিকটা পরিবহনের সুবিধা নিয়ে, এবং অনেকটা মজুত করবার সাধ্য থাকায় অন্নাভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। মহেন্দ্র স্ত্রী - সন্তান - সহ গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু তিনি ভরসা রাখেন যে, মুর্শিদাবাদ, কা শিমবাজার বা কলকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হবে। এই পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল বিশ শতকের বাংলায় ১৯৪৩-এর মন বন্তরে। 'আনন্দমঠ' -এর সন্ন্যাসী সংঘে খাদ্যাভাবের কোনও চিহ্ ছিল না; মধ্যবিত্ত- প্রধান যে গ্রামটিতে -এর জীবানন্দের ভ গ্নীর সংসার, সেখানেও অন্নের জোগান ব্যাহত হয়নি। ঝিজোড়া মানব সভ্যতায় ক্ষুধার সত্য অনেকটাই সামাজিক ধনবৈষম্যের পরিস্থিতির ফলে উদ্ভুত -- তা-ও আমরা এখান থেকে অনুভব করতে পারি।

আমরা ফিরে যাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও মঙ্গলকাব্যগুলিতে সাধ ারণ জীবনের চলচিচত্রই বর্ণিত হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম তাঁর 'আত্মপরিচয়' -এ সেই যে লিখেছিলেন শালুকডঁ াটা খেয়ে তাঁর প্রাণধারণ করতে হয়েছিল এবং 'শিশু কাঁদে ওদনের তরে' --এই ছবি মাঝে মাঝেই ঘুরে এসে মঙ্গলকাব্যে - - দেব মাহাত্ম্যের আবরণ ভেদ করে। সেখানে পার্বতী শিবকে বলেছেন---

"রন্ধন করিতে বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যা পাত্রে দিব তাহা ঘরে নাই।"

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' - এ দেবী অন্নপূর্ণার দয়ায় অনেকেই খাদ্য লাভ করেছে --- সেই প্রসঙ্গ আছে। 'অন্নদামঙ্গল' - এর মহাদেব যে দিন ভাত না খেয়ে পথে বেরিয়েছেন, সেদিন তাঁর সবকিছুই বিস্বাদ লাগে। শিবের সেদিন --- 'ক্ষুধায় কঁ াপয়ে অঙ্গ।' বাঙালির লক্ষ্মীর পাঁচালিতে লিখিত হয় ---

"তণ্ডুলের সাথে দেবী আছেন জড়ায়ে।"

আর, ভক্তকবি রামপ্রসাদ সরাসরি যেন আর্তনাদ করে ওঠেন তাঁর ভক্তিগীতিতে --- "অন্ন দে অন্ন দে অন্ন দে গো অন্নদা।"

বাংলা সাহিত্যে ক্ষুধার চিত্রণ বিপুলভাবে বিস্ফোরিত হল ১৯৪৩ বা ১৩৫০ এর মন্বন্তরে। এই প্রসঙ্গে ক্ষুধার সঙ্গে মন বন্তরের সম্পর্কটি একটু বুঝে নেওযা যায় মন্বন্তর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এক মনুর শাসনকাল থেকে পরবর্তী মনুর শ াসনকালে যাবার মধ্যবর্তী পর্যায়। এই অর্থ ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেক মনুর শাসনের পর্বান্তরে পরবর্তী মনুর শ াসনকাল শু হবার মধ্যকালীন অরাজকতা ও বিপর্যয় -- এই হল মন্বন্তর শব্দের আভিধানিক অর্থ। প্রচলিত অর্থে এই বিপর্যয়ের ধারণাটি ব্যাপক খাদ্যাভাবকে বোঝায়।

এই খাদ্যাভাব সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক কারণে এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে। অনেক সময়ে দুটি কারণ সম্মিলিতও হয়। প্রাকৃতিক ক ারণের মধ্যে পড়ে অতিবৃষ্টি (১৬৫০-৫২ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াতে অতিবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়), অনাবৃষ্টি (কৃষিপ্রধান পশ্চাদপদ দেশগুলিতে খরার কারণে দুর্ভিক্ষ মাঝে মাঝেই ঘটে। ভারতে পূর্বোক্ত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছাড়াও ১৮৭৬ ও ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ইথিওপিয়াতে ১৯৭৩ -এ অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ হয়।) বন্যা দুর্ভিক্ষের একটি কারণ (বাংলাদেশে ১৯৭৪ -এ বন্যার ফলে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল)। অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, শৈত্যপ্রবাহ, প্রচণ্ড ঝড় ইত্যাদি কারণে সাময়িক খাদ্যাভাব যে - কোনও দেশেই দেখা দিতে পারে। তবে একালে এই কারণগুলির ফলে খাদ্যাভাব ঠিক দুর্ভিক্ষের রূপ নেয় না।

কীটপতঙ্গের আক্রমণ, ইঁদুরের উপদ্রব, গাছের রোগ ইত্যাদি কারণে দেখা দিতে পারে খাদ্যাভাব। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ১৮০৩-০৪ খ্রিষ্টাব্দে পঙ্গপালের আক্রমনে বিপুল শস্য - বিনষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

অতীতে যখন চিকিৎসা - বিদ্যার উন্নতি ঘটেনি তখন মহামারীতে বহু লোকের মৃত্যু ঘটত এবং খাদ্যাভাব দেখা দিত। চতুর্দশ শতাব্দীতে চিন দেশে মহামারীতে এই মৃত্যু ও মন্বন্তরের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। তার অল্পকাল পরে, ওই চতুর্দশ শতকেই এই ধরনের মহামারী বা 'ব্ল্যাক ডেথ' দেখা দেয় ইতালিতে। ভারতে ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে আর রাশিয়াতে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে প্লেগ - এর ভয়াবহ সংক্রমণে প্রাণনাশ ও খাদ্যাভাব ঘটে।

মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কারণ হল যুদ্ধ। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ও যুদ্ধের আশঙ্কায় শস্যের উৎপাদন বন্ধ হলে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে শস্য বাজেয়াপ্ত করলে, অসাধু ও লোভী ব্যবসায়ীদের মজুতদারি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন বাংলা ১৯৪৩ -এর মন্বন্তর এর কারণ সমন্বয়েই প্রধানত ঘটেছিল। তার সঙ্গেই উদ্ভূত হয়েছিল এমনই বিচিত্র পরিস্থিতি যে, জাপানিরা আসতে পারে --- এই আশঙ্কায় উৎপাদিত শস্য নষ্টও করে দেওয়া হয় যাতে জাপানিরা এসে খাদ্য না পায়।

বাংলা সাহিত্যে ক্ষুধাকে অবলম্বন করে যা - কিছু রচিত হয়েছে তার সিংহভাগই ১৯৪৩ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০)-কে আশ্রয় করেছে। তার আগের লেখা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' - এর উল্লেখ আমরা আগে করেছি, পরে স্বাধীন বহু সংখ্যক দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষকে নিয়ে যেসব গল্প ও কবিতা লেখা হয়েছে তার প্রবাহ শেষ হয়নি আজও।

বাংলায় ১৯৪৩-এর মন্বন্তরকে আশ্রয় করে যে -সব গল্প - উপন্যাস - নাটক - কবিতা লেখা তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টাকরছি। এক্ষেত্রে মন্বন্তরের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা যাব না। কারণ আমাদের আলোচনার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য মন্বন্তর নয়, ক্ষুধা। সব মন্বন্তরই একাধিক কারণের সমবায়ে ঘটে থাকে। সে-বিষয়েও আমরা আলোচনা করব না কারণ যে - বিষয়ে বহু গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

মন্বন্তর কেন্দ্রিক সাহিত্যেরও আছে প্রকারভেদ। কোথাও বড় হয়ে ওঠে মানুষের সার্বিক অসহায়তা, কোথাও শোনা যায় প্রতিবাদী কণ্ঠ। কোথাও ক্ষুধাকে জয় করে প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের মানবতাবোধ। আমরা কেবল সেই অংশগুলিই বেছে নেব যেখানে মানুষের মর্মান্তিক ক্ষুধার অনুভব বড় হয়ে উঠেছে লেখকের রচনায়।

এই দিক থেকে ভাবলে অনেক সুপরিচিত সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। রচনাটির কোনো ঘ াটতিরকারণে নয়; বিশেষভাবে ক্ষুধার চিত্রণ নেই বলে। প্রথমেই মনে পড়ে গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস 'পঞ্চাশের পথ' (অক্টোবর ১৯৪৪), 'তেরশ পঞ্চাশ' (জানুয়ারি ১৯৪৫) এবং 'ঊনপঞ্চাশী' (জানুয়ারি ১৯৪৬)-র কথা। দ্বিতীয় মহ াযুদ্ধ ও মন্বন্তরকে নিয়ে এ সু-বিশ্লেষণ - সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। কিন্তু তবু আমরা এই উপন্যাসত্রয়কে নিয়ে বিশেষ আলোচনা করব না। কারণ এই উপন্যাসে ক্ষুধা ও এই মন্বন্তরের সম্পর্ক, মন্বন্তরের কারণ, কমিউনিস্ট পার্টির

অবস্থান -- ইত্যাদির বিশ্লেষণ যতটা আছে -- ততটা নেই ক্ষুধার চিত্র। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে মন্বন্তরের সময়ে বহু জায়গা ঘুরেছিলেন গোপাল হালদার, দেখেছিলেন বহু পরিসংখ্যান ও রিপোর্ট। নিজেরাও তাঁরা কিছু প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। শাসক - সৃষ্ট মন্বন্তরের চেহারাটি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন গভীর মননশীলতায়। ফলে এই ত্রি-পর্ব উপন্যাসে বাংলা এই মন্বন্তরের পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র আমরা পাই। সেই সঙ্গেই পাই গ্রামের মানুষের শহরে আসার ছবি, নিরাশ্রয়তা, লঙ্গরখানা, মানুষের ভিক্ষা চাওয়া, অসহায়তা ও মৃত্যুর চিত্রণ। অবশ্যই মানুষের খাদ্যাভাব ও ক্ষুধা এই উপন্যাসের একটি বড় দিক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) উপন্যাসেও বাংলার এই করাল সময়ের যথাযথ চিত্রণ পাই। এখানেও আছে সার্বিকভাবে মন্বন্তর বিশ্লেষণ, সেই সঙ্গে খাদ্যাভাবের ছবি। কিন্তু মানুষের ক্ষুধার শরীরী অনুভব ও তার প্রতিক্রিয়া 'অশনি সংকেত' (১৯৪৪) উপন্যাসে যেভাবে তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তেমন পারেননি গোপাল হালদার বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় --- কেউই। গ্রামের মানুষকে আন্তরিক ভালোবাসায় আপন করে নিয়েছিলেন বলেই তাদের অন্নরিক্ত দেহমনকে এমনভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন তিনি। উপন্যাস শু হয়েছে চালের দাম ও ধানের দর বাড়ার প্রসঙ্গ দিয়ে। বিশেষ বিশ্লেষণে না গিয়ে এক ছত্রে দুর্ভিক্ষের মূল কোথায় তা বলে দিয়েছেন লেখক --- " বাবুরা এত বড় আড়তদার, সব ধান বেচে দিয়েছে গভর্নমেন্টের আড়তদারের কাছে। এক দানাধান রাখেনি।" বিভূতিভূষণ বর্ণনা করেছেন একটি চালের দোকান লুঠ হবার দৃশ্য যা আর কোলো লেখকের লেখায় নেই। ক্ষুধা - জাতঅপরাধপ্রবণতার যথাযথ তথ্য পাই এখানে। ভারতে অভাবে মানুষ খাচ্ছে শাক - পাতা, গেঁড়ি - গুগলি -- এই ছবিও পাওয়া যাবে না আর কোথাও। একমুঠো চালের জন্য শরীর বিক্রি করে দেয় গ্রামের বধূ, অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চোখের সামনে। 'অশনি সংকেত' - কে মোটের উপর ক্ষুধাভিত্তিক একটি উপন্যাস বলা যায়।

মানুষের অনাহার ও ক্ষুধার বিবরণে আমাদের তীব্রভাবে আঘাত করতে পারেন সুবোধ ঘোষ তাঁর 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪) উপন্যাসে। যদিও এই উপন্যাসেও মন্বন্তরকে সামগ্রিকভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি লেখকদের বিরূপতা এবং জনযুদ্ধ - নীতির প্রতি অসমর্থন ছিল বেশ প্রকট। তবু ক্ষুধা - পীড়িত মানুষের পরিস্থিতি আর অভাবকে যেভাবে তিনি ভাষায় প্রকাশ করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর বিবরণ থেকে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ছত্র উদ্ধার করছি।

"গাঁয়ে কোথাও একদানা চাল নেই... কায়েতপাড়ার সুন্দর সুন্দর বৌগুলি পর্যন্ত সব শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে গেছে।"...

'শকুনের ঝাঁকের মত একদল স্ত্রীলোক পচা ফলের ওপর লাফিয়ে পড়ে নিজদের ছিন্নভিন্ন করতে লাগল।"

"পেট আর পাঁজরাগুলির মধ্যে নিশ্বাদের স্পন্দন এখানে লুকোচুরি খেলেছে।"

বর্ণনা আছে আরও অনেক। এক মা তার অপুষ্ট - শরীর বালক - পুত্রকে বন্ধক রেখেছে এক নারীর কাছে। রেখে সেই টাকায় কিছু খেয়েছে। কে ভাড়া নিল সেই অপুষ্ট শিশুকে? সে-ও আর এক ক্ষুধা - পীড়িত নারী। ছেলেটিকে দেখিয়ে সে ভিক্ষে করে। এইভাবে ভিক্ষা, অনাহার, ক্ষুধা, মৃত্যুর বিবরণ চলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা।শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে আমাদের।

লেখা হয়েছে আরও অনেক উপন্যাস যেগুলিতে যুদ্ধ ও মন্বন্তর -- কখনও মূল বিষয়, কখনও প্রান্তিক। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্পণ' আর 'চিন্তামণি' --- দুটিই ১৯৪৫-এ প্রকাশিত। সরোজকুমার রায়চোধুরী 'কালো ঘোড়া' (১৯৪৬), সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'রাত্রি (১৯৪৫)। তবে ক্ষুধা ও ক্ষুধার্ত মানুষ উপন্যাসগুলির প্রধান অবলম্বন নয়। বরং নাম করা চলে ভবানী ভট্টাচার্যের ইংরেজি ভাষায় লেকা উপন্যাস 'সো মেনি হাঙ্গারস' (১৯৪৭) -এর।

মন্বন্তর, অন্নাভাব, ক্ষুধা নিয়ে লেখা হয়েছে অজস্র বাংলা ছোট গল্প। খাদ্যাভাব প্রায় সব গল্পেই প্রসঙ্গ হিসেবে থাকলেও সব গল্পেরই কেন্দ্রীয় ঐক্য - প্রতীতি ক্ষুধা নয়। ক্ষুধার্ত মানুষও কোনও কোনও সময়ে মানবিক ঔদার্যে উদ্ভাসিত হয়েছে -- এমনও দেখা যায় অনেক গল্পে। মধ্যবিত্ত লেখকের গল্পে মধ্যবিত্ত পাঠকের জন্য এই বিশ্বাসের রূপায়ণ বুঝি বা স্বাভাবিক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাযের গল্পে এই ব্যাপারটি দেখা যায়। বিভূতিভূষণের 'ভীড়', 'পার্থক্য', তারাশঙ্কররের 'পৌষলক্ষ্মী', 'বোবা কান্না' ইত্যাদি গল্পে মন্বন্তর, অনাহার ইত্যাদি প্রসঙ্গ এলেও গল্পগুলির অবলম্বন ব্যক্তি - মানুষের ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সহমর্মিতা, শোকতীব্রতাইত্যাদি।

দুর্ভিক্ষ - পীড়িত সময়, শীর্ণ গ্রাস, ফুটপাতে মানুষের মৃত্যু, লঙ্গরখানা, নারীদের ব্যবসায়, অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফা -

লোভ,কালোবাজার, মধ্যবিত্তদের সংকট --- এই সব বিষয়বস্তু ঘুরে ঘুরে আসত অনেক বাংলা ছোটগল্পে। এই আকালের অনেক গল্প লিখেছেন পরিমল গোস্বামী, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মন্বন্তর বিষয়ক একটি গল্প - সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন পরিমল গোস্বামী (জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৪৪)। সংকলনটির নাম ছিল 'মহামন্বন্তর'। ছিল বারোটি লেখা, ভূমিকা লিখেছিলেন গোপাল হালদার, 'নিবেদন' অংশটি লিখেছিলেন সম্পাদক পরিমল গোস্বামী। সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য সংকলনটির ভূমিকা ও নিবেদন অংশ থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি।

''মন্বন্তর শেষ হয়নি, মহামারী তার জের টেনে চলেছে। হয়ত, দ্বিতীয় মহামন্বন্তরের আয়োজন হচ্ছে। তবু চোখের উপর আমরা যে শ্মশান দৃশ্য দেখছি দু'একটি প্রয়াস তার হয়েছে, ইংরেজিতে ও বাংলায়। সে প্রয়াস দেখে কেবলই মনে হয় -- কত সত্য, কিন্তু কত অসম্পূর্ণও।

আসলে এই মন্বন্তরকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন ঐতিহাসিক নয়, স্রষ্টা। তাঁর দৃষ্টিতে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে তবু একটি সম্পূর্ণতার স্বাক্ষর থাকবেই।

বাংলাদেশের মন্বন্তর তার শিল্পীদের মনে যে কত বড় আলোড়ন তুলেছে, মন্বন্তরের মধ্যে বসেও আমরা তা সবিস্ময়ে দেখেছি, আর স্বীকার করেছি --- বাংলার শিল্পী ও সাহিত্যিকরা তাঁদের দায়িত্ব বিস্মৃত হননি। শিল্পের পক্ষেও এ এক শুভ লক্ষণ যে, শিল্পীরা তার আঘাতে সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, তাঁদের দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠছে।' (ভূমিকা)

''১৯৪৩ সাল বাংলাদেশের বুকে যে বিপর্যয় বহন করে এনেছে তার তুলনা বাংলাদেশের ইতিহাসে আর মেলে না। আমরা এই বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে এখনও চলছি এবং যদি কখনও সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারি তাহলে তখন এর ভয়াবহতা হয়তো আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে পারব।

এদেশে একবার মন্বন্তর ঘটেছিল, এবারে ঘটল মহামন্বন্তর। এক দিকে পথে পথে ক্ষুধার্ত নরনারীর মিলিত আর্তনাদ, অন্যদিকে খবরের কাগজে সভায় - সমিতিতে তার প্রতিধ্বনি। চোখের সম্মুখে রাজপথের উপর লোক মরছে, পথে পথে মৃতদেহ পড়ে আছে, মা মৃতশিশুকে কোলে নিয়ে কাঁদছে, স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহের পাশে কাঁদছে, কলকাতা শহরেই এই ভয়াবহ দৃশ্য দিনের পর দিন আমরা দেখেছি; আর তার সঙ্গে দেখেছি এই হতভাগ্যদের ফোটোগ্রাফ, মৃত ও মুমূর্ষর বীভৎস সব ছবি, সর্বত্র একই ধরনের ছবি, যেমন পথে পথে একই ধরনের কান্না আর একই ধরনের মৃত্যু।

ব্যাপারটি এমনই কল্পনাতীত, এমনই আকস্মিক যে প্রথমে এ দৃশ্য চোখে দেখলেও কারও ঠিক বিশ্বাস হয়নি। প্রথমে এল গৃহ - সংসার ভেঙে দিয়ে পল্লীবাসীরা। এসে চালের দোকানের সম্মুখে 'কিউ' করে দঁড়াল। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, বসল। শেষে বসতেও পারল না শুয়ে পড়ল। চবিবশ ঘন্টা পথের উপর অপেক্ষা করে থাকলে তবে কনট্রোলের দোকানে সকালে দু'সের চাল মিলতেও পারে। রৌদ্রে বৃষ্টিতে পথের উপর পশুদলের মতো জীবন্মৃত নরনারীর ভিড় জমে গেল। যারা মরে গেলেও পথে বেরিয়ে আসতে পারেনি তাদের কি দুর্দশা হল তা জানা গেল না।

এই অতি অপ্রত্যাশিত আকস্মিক দৃশ্যে লোকে হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারেনি। সর্বনাশ যত বড়ই হোক তার আকস্মিকতা অনেক সময়েই হাস্যকর হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ দলে দলে হঠাৎ পথের ক্ষুধার্ত গ্ন কুকুরের মতো ব্যবহার করছে, ডাস্টবিন থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে, এ দৃশ্য আমাদের অভিজ্ঞতাকে হঠাৎ ধাক্কা মেরে হাস্যরসের সৃষ্টি করে। তারপর ধীরে ধীরে বোঝা যায় সে কিমারাত্মক ররমের হাস্যকর। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই তা বোঝা গেল। আরও বোঝা গেল, এই সর্বনাশ কোনো বিশেষ একটা জায়গায় ঘনীভূত নয়, সমস্ত শহরে ব্যাপ্ত, সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত।'' (নিবেদন)।

সংকলেনর উৎসর্গপত্রটিও ভুলে যাওয়া উচিত নয় --

বাংলার অন্নহীনের হাহাকার জাতিধর্মনির্বিশেষে যাঁকে অক্লান্ত
অন্নদান সেবায় দীক্ষিত করেছে
যাঁর মুখে ভাষাহীন আর্ত বাংলার বাঁচার অধিকার বজ্রনির্ঘোষে
ধ্বনিত হয়ে উঠেছে,
যাঁর পৌষ মুমূর্ষু বাংলাকে গৌরবহীন মৃত্যুর হাত থেকে
ছিনিয়ে আনার মহৎ কাজে নিযুক্ত,

সেই পরম শ্রদ্ধেয় দেশপ্রেমিক
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে
মহামন্বন্তর
উৎসর্গ করা হল।

সংকলনটিতে বিভিন্ন ধরনের গল্পই আছে। সবই মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা হলেও সরাসরি ক্ষুধার চিত্রণ আছে। যে গল্পগুলিতে সেগুলির মধ্যে অন্যতম নবেন্দু ঘোষের 'কাল্কি'। ফুটপাতে চলে আসা মা, বালিকা ও বালক পুত্রকন্যা। প্রতি মুহূর্তে ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই। ভিক্ষা। একটু পয়সা পেলে ভাইবোনের নির্লজ্জ কলহ -- নিষ্ঠুর ও হিংস্র। গল্পটিতে আমাদের মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে। ডাস্টবিনথেকে কুকুরেরও অভুক্ত খাবার সংগ্রহ করা এবং অবধারিত রোগের সংগ্রমণে নির্জীব প্রাণের নিষ্প্রাণ হয়ে যাওয়া।

পরিমল গোস্বামীর 'ভাঙন' গল্পে ক্ষুধা ও মনস্তত্ত্বের সুন্দর সম্মিলন। ক্ষুধা - বিপর্যস্ত লক্ষী, তার স্বামী ও সন্তান - সকলেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে শহরে। লক্ষ্মী ফুটপাতে পড়ে থাকে --- একা, অসাড়, কিছু ভাবার ক্ষমতা নেই। তারপর অন্নসত্র থেকে খিচুড়ির ব্যবস্থা হল। কয়েকদিন খেতে পারবার পর তার মন স্বামী পুত্রের জন্য বোধ করতে লাগল শোক। দুঃখ অনুভব করবার জন্যও পেটে খাবার থাকা চাই -- এই সত্যটি মির্মম হয়ে ফুটে উঠেছে গল্পে।

অভাবের তাড়নায় মধ্যবিত্তের সংসার কলুষিত হয়ে যায়। প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার' গল্পে দেখি মা কিশোরী মেয়েকে পুষদের মেস-এ ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন -- আট আনা, এক টাকা চেয়ে আনবার জন্য। বিনিময়ে যদি কিশোরী - শরীরে একটু দাগ লাগে - তা ধর্তব্য নয়

কোন কোন লেখায় - যেমন মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' এবং শচীন সেনগুপ্তের লেখা 'রাজধানীর রাস্তায়' নাটিকায় মন বন্তরেরসেই চিত্রটি ফুটে উঠেছে যেখানে গ্রামের কৃষক আর দিন - মজুর পথের ভিক্ষুক হয়ে গেছে কিন্তু মধ্যবিত্ত আর উচচবিত্তের খাদ্যবিলাসরয়েছে অনাহত। ভেবে দেখতে গেলে ঋিসভ্যতায় ক্ষুধার উৎপাদনে এই বিত্ত - বৈষম্যের জায়গাটি তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক মানুষের অনেক বেশি খাবার আছে বলেই -- অনেক মানুষের খাবার নেই। সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক আর বৈজ্ঞানিক বহু জটিল তত্ত্বের অলিগলি পার হয়ে এই সিদ্ধান্তটি কিন্তু নির্মম সত্য হয়ে থাকে।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ক্ষুধা' গল্পে একদা - মধ্যবিত্ত কিন্তু নিঃস্ব হয়ে যাওয়া জীবনকৃষ্ণের সংসারের চিত্রে ক্ষুধাই উপজীব্য। লেখক সুন্দর দেখিয়েছেন -- যে কোনও সংকটকালে নারীর উপর চাপে বাড়তি বোঝা। জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী সন্ধ্যা অ াগে স্বামী সন্তানদেরখাইয়ে তারপর খায়। অর্থাৎ সে খায়ই না। তাকে বহন করতে হচ্ছে গর্ভের ভার। অনাহারেও শরীর ভোগ্য হতে দিতে বাধ্য থাকতে হয় ।কন্ট্রোলের চাল আনতে তাকে যেতে দেয় না জীবনকৃষ্ণ। দু'জন গেলে চালের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু সন্ধ্যা যেতে চাইলে নারী বলেই তাকে স্বামীর কথা শুনতে হয়--- ''সেজেগুজে টিপ পরে কন্ট্রোলের দোকানে গিয়ে দাঁড়াতে ইচেছ হচেছ বুঝি?'' এরপর সরোজকুমার রায়চৌধুরী লেখেন সন্ধ্যার ভাবনার ভাষারূপ -- ''হ্যাঁ ইচেছ লা থি মেরে সব ভেঙে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় পালাই।'' -- কিন্তু এসব কথা বলতে পারেনি সন্ধ্যা। গল্পের শেষে ক্ষুধা, সহ্য করতে না পেরে কন্ট্রোলের দোকানে লাইনে দাঁড়িয়ে গর্ভপাত হয়ে তাকে সরকারি হাসপাতালে যেতে হয়। মন্বন্তরভিত্তিক অধিকাংশ গল্পে অবশ্য এই একটা সমস্যা থাকেই। গল্পটি খুব বেশি প্যাথেটিক হয়ে পড়ে। শিল্পমূল্যে খুব বেশি দাঁড়িয়েছে সব গল্প -- এমন নয়।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র 'ম্যায় ভুখা হু', 'মহালাকে নিশ্বাস' ইত্যাদি গল্পে দারিদ্র্য, অনাহার, ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে দেখানো হয়েছে ম ানুষের স্বার্থত্যাগ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র একটি চমৎকার শিল্পোত্তীর্ণ গল্প লিখেছেন 'মদনভস্ম'। বিবাহ - বহির্ভূত প্রেমে জনিয়ে পড়েছিল এক নারী। প্রেম মিথ্যা ছিল না। কিন্তু ক্ষুধার প্রদাহে ভস্ম হয়ে গেছে -- সেই ভালোবাসা। এখন কিছুটা ভাত জুটে যাওয়ায় সেই নারী ও তার প্রেমিক দুজনেই দুজনকে বঞ্চিত করে নিজে খেতে চায় সেই ভাত। নারীর বৈধ স্বামী আড়াল থেকে সেই দৃশ্য দেখে খুশি হতে পারে না। আবার অখুশিও হতে পারে না। সে বিষণ্ণ হয়ে যায়। এই মদনভস্ম 'কুম ারসম্ভবম্' কাব্য থেকে আসেনি। প্রেম শুদ্ধতা পায়নি এই মদনভস্মে। ভাতের অভাবে আত্মা হয়ে গেছে মলিন। ক্ষুধার অ াগুনে ভস্মীভূত মদনের আর পুনর্জন্ম নেই।

আর একটি অবিস্মরণযোগ্য গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'কে বাঁচায় কে বাঁচে'। অফিসের কেরানি মৃত্যুঞ্জয়। ব্যক্তিগতভাবে

মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা তার নেই, কিন্তু তার সামনে হাজারে হাজারে মরে যাচ্ছে মানুষ। সে ক্রমে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারপর কিছুটা অপ্রকৃতিস্থই হয়ে যায়। ভিক্ষের মগ হাতে নিয়ে পড়ে থাকে ফুটপাতে। তাকে জানতে হবে এই ক্ষুধার এবংঅন্নচাহিদার স্বরূপ। এ যেন ক্ষুধা ছাপিয়ে ক্ষুধার দর্শনের আখ্যান একদিকে। অন্যদিকে, ক্ষুধার অস্তিত্ব কীভাবে সমাজের নিষ্ঠুর স্থিতাবস্থায় ভাঙন ধরায় --- তারই অনুসন্ধান। সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না এই গল্পের শিল্পরূপ।

বাংলা সাহিত্যে ক্ষুধার গল্প যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ননী ভৌমিক। তাঁর 'ধানকানা' (১৯৪৬) সংকলনের অন্তর্গতগল্পগুলিতে নিঃস্ব মানুষের জীবনই স্থান পেয়েছে। দু'মুঠো মুড়ির জন্য নরহত্যার ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি -- যা মিথ্যা ছিল না সেই সময়ে। সোমনাথ লাহিড়ীর গল্পে শিশুকে ফেলে রেখে মা চলে যায় --- নারী মাংসলোভীর পিছনে খাদ্যের ও কয়েকটি পয়সার প্রত্যাশায়। গল্পটির নাম '১৯৪৩'। সুশীল জানার গল্প 'কুকু'। গুদাম থেকে চাল চুরি করেছে মানু কিন্তু সে এত দুর্বল যে চালের বস্তার ভারে পড়ে গিয়ে আর উঠতেই পারে না। তাকে খেতে শু করে ক্ষুধার্ত কুকুরের দল। গুদামের প্রহরী নিথর হয়ে দৃশ্যটি দেখে। শান্তি দেবীর গল্প 'কিউ'। দরিদ্র দম্পতি ও একটি কুড়োনো অপুষ্ট ও অর্ধমৃত শিশু। বহুকাল পরে ভাত রান্না হয়েছে। ভাত নামার মূহূর্তেই বাচচাটি মারা গেল। ভাতের ভাগ দিতে হবে না জেনে স্বস্তি পায় পুষটি। ক্ষুধা মানবিকতাবোধ হরন করে -- এই সত্য অনেক গল্পেই ফুটে উঠেছে।

অনেকেই জানেন না সুকান্ত ভট্টাচার্য দুটি গল্প লিখেছিলেন মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে। প্রকাশিত হয়েছিল 'অরণি' পত্রিকায়। প্রথম গল্পটির (২ এপ্রিল, ১৯৪৩) নাম 'ক্ষুধা'। চালের অভাব দুই ভাইয়ের সংসার ভেঙে যাবার আখ্যান। দ্বিতীয় গল্পটিতে এক অন্ধ ভিক্ষুক ভিক্ষা না পেয়ে একদিন যোগ দেয় মিছিলে। অবশ্য লাঠির ঘায়ে প্রাণ যায় তার। একটু কাঁচা লেখা -- তবু অবলম্বন এই গল্পের।

মন্বন্তরের সময়ে লেখা হয়েছে বেশ কিছু নাটক। সেসব নাটক আমাদের কাছে পরিচিত। বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী','নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার', 'দুঃখীর ইমান', দিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীপশিখা', জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের 'চালের দর'। প্রতিটি নাটকেই মন্বন্তর চিত্রে গাঁথা হয়ে আছে ক্ষুধার্ত মানুষের জীবন।

বাংলার এই মন্বন্তরে কবিতাও লেখা হয়েছে অনেক। 'আকাল' নামেক একটি কবিতা সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৪৪-এ। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এই দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে রচনা করেছিলেন তাঁর 'নবজীবনের গান'। ফসলহীন প্রান্তর, শূন্য ও রিক্তগ্রাম এবং কোথাও নতুন জীবনের স্বপ্ন কবিতাগুলিতে দেখি। কিন্তু প্রথাগত ক্ষুধার তাড়নায় বিপর্যস্ত মানুষের বিবরণ সমসময়ে ততটা আসেনি কবিতায়।

এই সংকলনটিতে বিষ্ণু দে লিখেছিলেন 'আকাল', নামেরই কবিতা ---

সকাল না হতে কাঁপে ক্রন্দসীও চালের আড়তে
অনাহারে অসহায় কাতারে কাতারে কোনোমতে
কুইনিন্‌হীন দেহ ঢেকে কাঁপে ক্ষুধার্ত নির্বোধ।

পরে কবি কবিতাটির নাম পরিবর্তন করে দেন '১৯৪৩ অকালবর্ষা'।

সমর সেনর 'গৃহস্থ বিলাপ' কবিতাও মনে পড়ে---

একমাত্র ক্ষুধার জ্বালা
দেহ দীর্ণ করে ক্ষুধার অঙ্গার জমে;
নীড় নেই, মারী দিগ্বিজয়ী
স্ত্রী কন্যা গিয়েছে অন্য পথে
নিদ্দেশ নরকে।

আমার দৃষ্টান্ত আর বাড়ব না। ঐ সময়ে বহু কবি --- অণ মিত্র, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ ঝিাস এবং আরও অনেকেই বহু কবিতায় সামাজিক বৈষম্য ও ক্ষুধার্ত মানুষের কথা লিখেছেন। আমরা দুর্ভিক্ষ - পীড়িত মানুষের ক্ষুধার অতলতাকে অনুভব করে লেখা জীবনানন্দের একটি কবিতাংশ দিয়ে শেষ করব বাংলার মন্বন্তরের সময়ে

রচিত কবিতার প্রসঙ্গ
আরো বেশি কালো কালো ছায়া---
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে
ফুটপাত থেকে দূর নিত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে
(তিমিরহননের গান, সাতটি তারার তিমির
অল্প কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে জীবনানন্দ লঙ্গরখানা, ফুটপাতে মৃত্যু আর মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে সেই দুর্ভাগ্য জনশ্রেণির প ার্থক্য সবই নির্দেশ করেছেন।
কিন্তু যত ব্যাপকই হোক, বাংলার ১৯৪৩ -এর মন্বন্তর এক সময়ের শেষ হল। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের মানুষের ক্ষুধার অবসান তাতে ঘটে না। পৃথিবীতে যতদিন থাকবে ধন-বৈষম্য, যতদিন থাকবে শ্রেণি - পার্থক্য --- ততদিনই থাকবে ক্ষুধা। সম াজমনস্ক লেখকেরা তাই চিরকালই লিখবেন ক্ষুধার ইতিকথা। বাংলা সাহিত্যে সত্তরের দশকে অত্যন্ত সমাজমনস্ক একদল গল্পকারের আবির্ভাব ঘটেছিল। আজও তাঁরা সক্রিয়। তাঁদের লেখায় ক্ষুধার্ত মানুষের অজস্র মুখের মিছিল। মহাশ্বেতা দেবীর একগুচ্ছ গল্প পাওয়া যাবে যেখানে কেন্দ্রীয় অবলম্বন হল ভাত। সাধন চট্টোপাধ্যায়, অমর মিত্র, অনিল ঘড়াই, সৈকত রক্ষিত, কিন্নর রায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী এবং আরও অনেকেই ক্ষুধার শিল্পরূপ নির্মাণে দক্ষতার পরিচয়া দিয়েছেন।
আমরা কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে এই ক্ষুধার সাহিত্য - প্রসঙ্গ শেষ করব। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও মহাশ্বেতী দেবীর মতে াই বারবার ভাতের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন তাঁর কবিতায়। একেবারে প্রথম পর্বেই তিনি লিখেছিলেন ---- "একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে দুর্ভিক্ষের চাল" (দোল ও পুর্ণিমা, রানুর জন্য)। চিত্রকল্পটি বিমিশ্রিত --- চুরি, দুর্ভিক্ষ, ট্রেন, মধ্যরাত, চাঁদ, যুবতী ও চাল -- এতগুলি উপাদান মিলে অন্নরিক্ত, অন্নভিক্ষু মরিয়া মানুষের কাতরতা ফুটে উঠেছে পঙ্‌ক্তিটিতে।
তিনি আরও লেখেন---
মাগো এত ডাকি খিদের দেবতাটাকে
বেশি নয়, যেন দু'বেলা দু'মুঠো নুন - মাখা ভাত রাখে।
(কালোস্বস্তির পাঁচালী, মুখে যদি রক্ত ওঠে।

এ এক মন্ত্র টি দাও, টি দাও
বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাও।
সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা।
হেসে দিতে পারি স্বদেশেরও স্বাধীনতা।
(টি দাও, উলুখড়ের কবিতা)
পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে সত্তর - আশির দশকে কবিরাও ভাতকে প্রতীকী মর্যাদা দিয়ে লিখেছেন কবিতা। নির্মল হালদারের কবিতায় দরিদ্র শ্রমিক বলে -- ভাত খুঁড়তে যাব ভাতের খনি কোথায়। বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক দিনই অব্যাহত থ াকবে ভাতের খনির সন্ধান।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com